সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে যারা অবদান রাখতে পারেন

ইদানীং একটা মানসিক বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছি। যত আপ্তবাক্য ও হেদায়েতি বয়ান আমার মতো অনেক অভাজন পত্রিকার মাধ্যমে করে থাকেন, এর ভালো কিছু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আদৌ আমলে নেন কি-না? এই দ্বন্দ্ব-দোটানায় মাঝে-মধ্যেই হতোদ্যম হয়ে পড়ি। ভাবি, রাজনীতির কথা লিখতে পারলে হালে পানি পাওয়া যেত; অন্য কোনো বিষয়ের গুরুত্ব কম। করণ এ দেশের সবকিছু নিয়েই তো রাজনীতি। ধানের হাটে, গরুর হাটে রাজনীতি; বাসর ঘরে রাজনীতি; জন্ম-মৃত্যুতে রাজনীতি; সমাজনীতি-শিক্ষানীতি, শয়নে-স্বপনে ও পরজনম নিয়েও রাজনীতি। রাজনীতির আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে জীবনের পথ দেখি, নিজের উত্থান-পতন খুঁজি। রাজনীতি কখনো দেশকে পথে বসায়, আবার উন্নতির শিখরে পৌঁছে দেওয়ার স্বপ্ন দেখায়। এক বয়াতি মনের দুঃখে গেয়েছিলেন, 'গুরু গুরু বলে ডাকি গুরু রসের গোলা, এমন দোয়া দিলে গুরু তুমি কাঁধে দিলে ঝোলা। আহা আ-আ-আ-।' গুরুর কথায় চলতে গিয়ে একদিন শিষ্য ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এ দেশে এও এক অনিবার ট্রাজেডি। রাজনীতি কিন্তু সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়ন নিয়েই হবার কথা ছিল। প্রতিটা দলের গঠনতন্ত্রে তা ভালোভাবে লেখাও আছে। আমরা সেটাকে টেনে নীচে নামিয়েছি। রাজনীতির বিষবাষ্প চতুর্দিক কলুষিত করে ছেড়েছে। দেশে সামাজিক শিক্ষার ভরাডুবি। যা আছে কুশিক্ষা ও অশিক্ষা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অবস্থাও তথৈবচ। তাহলে সমাজ ও জাতির উন্নতি কীভাবে সম্ভব? শুধু অর্থ উন্নয়ন দিতে পারে না। আবার অর্থেরও দৈন্যদশায় ধরেছে। দেশ পরিচালনাও দেশের সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপর নিভর করে। প্রশাসনিক ধস ও সামাজিক অবিচারও সামাজিক কুশিক্ষার বহিঃপ্রকাশ। শিক্ষা ছাড়া সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়ন থাকে কী করে? পরিণতি কি– সচেতন মহল ভালো অনুমান করতে পারেন। শুধু মুখের কথায় তো আর চিড়ে ভেজে না! সমাজসেবার মনোভাব ও কর্ম না থাকলে সমাজ ও জাতীয় উন্নয়ন হয় না। এ দেশের রাজনীতির যতক্ষণ-না খোল-নইচে বদল করা হবে, ততক্ষণ রাজনৈতিক তরিকায় চলা নেতা, শিষ্য দিয়ে দেশের সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়ন হবে– একথা ভাবতে মন সায় দেয় না। আমি সে কাসুন্দি ঘাটতে গিয়ে লেখার উদ্দেশ্য-বিচ্যুৎ হতে চাইনে; কারো মনে বিরক্তির উদ্রেক করাতেও চাইনে। পরিবর্তিত সমাজে দীর্ঘ মেয়াদে গিয়ে রাজনীতি হয়তো সুস্থ সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতেও পারে। রাজনীতিবিদদের দিয়ে যখন সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উন্নতি আপাতদৃষ্টিতে আশা করা যাচ্ছে না, মন্দের ভালো হলেও বিকল্প তো একটা খুঁজতে হবে। সেজন্যই এত গৌরচন্দ্রিকা দেওয়া।

ভালো-মন্দ মিলিয়েই সমাজ। রাজনৈতিক মদদপুষ্ট একটা বিশাল অংশ পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে জানি। কিন্তু এর মধ্যেও কোনো কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি এখনো ভালো আছেন। এদেরকে সমাজসেবায় সাথে নেয়া যায় কি-না দেখতে হবে। এছাড়া সমাজের একটা সচেতন ও সুশিক্ষিত অংশ রাজনীতির কর্দমাক্ত বানভাসি স্রোতে ভেসে যাননি; সুশিক্ষার প্রিজারভেটিভ মেখে এখনো এই সমাজেই নিভৃতে জীবনযাপন করছেন। এদেরকে নিয়ে আমরা আবার আশায় বুক বাঁধতে পারি। এদেরকে জাগিয়ে ঘরের বাইরে বের করে আনতে হবে। এদেরকে একত্র করা দরকার। এদের দিয়ে সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অনেকটাই উন্নতি করা যায়। কারণ এরাও তো একটা সামাজিক শক্তি। সমাজে এদেরও একটা অবস্থান আছে, শিক্ষা আছে, সুস্থ চিন্তাধারা আছে। তাহলে তারাই-বা সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে না কেন?

মানুষ পরিবেশের কারণে, ষড়রিপুর আধিক্যে মানুষ নামের কলঙ্ক হয়, পঙ্কিলতার সাগরে ডুবে যায়, আবার মানবিক গুণগুলো জাগিয়ে তুলতে পারলে মনুষ্যত্ব ও মানবতা বোধ ফিরে পায়, মানুষের মতো কর্ম করে, আচরণ করে। মানুষের অন্তর্বিষ্ট স্বভাব ছাড়াও সুশিক্ষা ও যোগ্য প্রশিক্ষণ এবং সুস্থ সমাজব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষকে 'মানুষের মতো মানুষ' রূপে গড়ে তোলা যায়। এভাবেই সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন শিক্ষিত সমাজ, আদর্শ রাষ্ট্র ও টেকসই জাতি গড়ে ওঠে। সমাজ উন্নয়নে এদের কাজে লাগানো যায়। ব্যক্তির সুষ্ঠু চিন্তাধারা সামষ্টিক সুস্থ চিন্তার উৎস। ব্যক্তির মানসিক উন্নতির মধ্যে সামষ্টিক উন্নতি নিহীত। তাই এদেরকে দিয়ে ব্যক্তির মানসিক উন্নতির চেষ্টা করতে হবে। ব্যক্তির উন্নতির মধ্য দিয়ে সামষ্টিক উন্নতিকে ত্বরান্বিত করতে হবে।

লায়ন্স ক্লাব ও রোটারি ক্লাবের সদস্যরা নিজে চাঁদা দিয়ে, অনুদান দিয়ে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ান, সমাজসেবা করেন। তাদের থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। জনসেবা ও সমাজসেবাও একটা অনিবার নেশা। এর মজা যিনি পেয়েছেন তিনিই মজেছেন। এ দেশে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত একটা ধার্মিক জনগোষ্ঠী আছে, তারাও একটা সামাজিক শক্তি, তারা পরকালের মুক্তি চান। তাদের অনেকেই জীবনের উদ্দেশ্যকে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে, ইহকালকে উপেক্ষা করে, কখনো নিরর্থক জেনে পরকালের মুক্তির নেশায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছেন। আমি তো দেখি, ইহকালের শিক্ষা, কর্ম, চিন্তা-চেতনা, সমাজসেবা, জনসেবা ও সৃষ্টিসেবার মধ্যেই ইহকালের ইবাদত, পরকালের মুক্তি। পুরো ধর্মদর্শন এই সৃষ্টি, কর্ম ও সৃষ্টিসেবার উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে। তারাও তো, একটু ভেবে দেখে, সমাজসেবা, মানবসেবা ও সৃষ্টিসেবায় যোগ দিতে পারেন। সৃষ্টিসেবার মধ্যে পরকালের মুক্তি খুঁজতে পারেন। স্রষ্টায় একান্তভাবে বিশ্বাসী প্রতিটা লোককেই সৃষ্টিসেবায় ও মানবসেবায় আনা সম্ভব।

তবলিগ জামাতের অসংখ্য ধর্মভীরু মুসলমান দেশ-বিদেশে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে ধর্ম প্রচারের কাজে মন দিয়েছেন। সমাজের অনেকে তাদের পথ অনুসরণ করে নামাজ-রোজা, হজ্জ-জাকাত ও তসবিহ-তেলাওয়াতের কাজে রত হয়ে পরকালের পথে নিজেকে সঁপে দিচ্ছেন। কিন্তু এদের অধিকাংশই সৃষ্টির উদ্দেশ্য– শিক্ষা, জীবন-জীবিকা-কর্ম, সমাজগঠনকে উপেক্ষা করে চলেছেন। প্রতিপালকের সৃষ্টিকর্ম, দুনিয়াদারি, সৃষ্টির সেবা, জীবনকর্ম ও পেশাকে একেবারে মূল্যহীন-নিষ্কর্ম করে ছেড়েছেন। যুগ যুগ ধরে এরা সমাজে সুশিক্ষা, ন্যায়নিষ্ঠা, হতদরিদ্র মানুষের জন্য সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন, আর্ত-মানবতার সেবা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিক্ষিত সমাজগঠন ও সত্য কতটুকু প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন, এসব কথা নিয়ে আজ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। আমার বিশ্বাস, এগুলোও 'দীনের খেদমত' ও 'হক্কুল ইবাদ'– পরকালের পাথেয়। এদেরকে বুঝিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক সুশিক্ষা, ন্যায় কাজের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানানো, দুঃস্থ সহায়তা ও দরিদ্র-মানবতার সেবার জন্য 'শিক্ষা-সেবা সমাজের' একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে আনতে পারলে সমাজ নিঃসন্দেহে উপকৃত হয়, একই সাথে তাদের পরকালের মুক্তিও মেলে।

একসময় বাম রাজনীতির ধারা এদেশের জনগোষ্ঠীর একটা অংশকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। উদ্দেশ্য সমাজসেবা করা; বঞ্চিত, নিপীড়িত, মেহনতি মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য কাজ করা। গণমানুষের মুক্তি ও শোষণহীন সমাজ গঠনের জন্য স্বার্থত্যাগী ও ভুক্তভোগীরা এতে ভূমিকা রেখেছিলেন। স্বাধীনতা-যুদ্ধের কিছুদিন পরেই বাম ধারার রাজনীতির মধ্যে মতাদর্শগত ভিন্নতার কারণে অর্ন্তদ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল। প্রভাবশালী অনেক নেতাই দলীয় আদর্শকে মনে মনে বিসর্জন দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। অন্তরে-প্রকারান্তরে বিত্ত-বৈভবের মালিক হয়ে গেলেন। দলীয় কর্মীরা ছত্রভঙ্গ হতে থাকলেন। ক্রমান্বয়ে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো থেকে

বাম রাজনীতির মেহনতি মানুষের মুক্তির স্বপ্ন বিদায় নিলো। শেষ বিদায়ের মৃদু রক্তিম রশ্মির চিক্কণ মনোহর ছোঁয়া এ দেশের পশ্চিম গগনের অধরেও কিঞ্চিত ধরা দিয়ে আবার হারিয়ে গেল। মাঝখান থেকে অসীম জীবনকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের নিগড়ে বাঁধতে গিয়ে বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষকে অকাতরে প্রাণ দিতে হলো। বাম নেতাদের অনেকে অন্য ডান দলে অনুপ্রবেশ করতে লাগলেন। ত্যাগী কর্মীরা বিনা প্রতিবাদে মনের দুঃখ মনে নিয়ে যার যার পথে রুজি-রোজগারের কাজে নেমে পড়লেন। তাদের মধ্যে আর্ত-মানোবতার সেবা, মেহনতি মানুষের জন্য ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দেওয়ার মনোভাব এখনো বিদ্যমান। পার্থক্য এটুকুই যে, যে-সব নেতা-কর্মীরা ধর্মকে সমাজ থেকে বিতাড়িত করে ধর্মহীন বাম-রাজত্ব কায়েম করতে চেয়েছিলেন, তাদের অধিকাংশই এখন সময় অতিক্রমণে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ভুলে গিয়ে নামাজ-রোজার আস্তিক মোড়কে নিজেদের পরকালকে সংরক্ষিত করে চলেছেন। কথা হচ্ছে, সুস্থ মানসিকতার বিকাশ ছাড়া মানব সভ্যতা ও সৃষ্টিকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। মানুষের জন্য সমাজ, রাষ্ট্র ও সৃষ্টির এত আয়োজন। স্রষ্টার এ প্রতিনিধিকে প্রচলিত আইনে বিচার না করে বিপ্লবের নামে অন্যায়ভাবে নিধন করার মতবাদকে সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন কোনো লোকই মেনে নিতে পারেন না। মানুষকে বিভক্ত করে, মানুষের নিধনযজ্ঞ চালিয়ে মানবতার মুক্তি আসে না। মতবাদ তখন অকেজো হয়ে যায়। অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সামাজিক বিভক্তি সমাজে প্রতিহিংসার জন্ম দেয়। অর্থনৈতিক ভিত্তিও সময়ের ব্যবধানে আপেক্ষিক। বাম রাজনীতির রাষ্ট্র ও সমাজগঠনের অনেক ব্যবস্থাকে আমাদের দেশের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, সামাজিক বুনন ও ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে খাপ খাইয়ে সংশোধিত মডেলে প্রয়োগ করতে পারলে সাধারণ মানুষের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হতো ও দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকতো বলে আমার বিশ্বাস। তবে সেখানে সততা, নৈতিকতা, শিক্ষা ও ধর্মীয় আদর্শ থাকা জরুরি ছিল। এগুলো সামাজিক দ্বন্দ্বকে মিনিমাইজ করে। সমাজসেবা ও মেহনতি মানুষের জন্য আত্মত্যাগে উজ্জীবিত অনেকেই বর্তমানে পরপারের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। আবার অনেকে এ সমাজেই বিভিন্ন পেশায় রয়ে গেছেন। এদের অনেকের মনে বঞ্চিত মানুষের মুক্তির নেশা, মানবতার ধর্ম রয়ে গেছে। তাদেরকে সমাজসেবা ও শিক্ষিত জাতি গড়ার আদর্শে আবার জাগিয়ে তুলতে পারলে তারাই শিক্ষিত সমাজ গঠনে অংশ নিতে পারেন।

সমাজে আরো কিছু পক্ষ আছে। এদের মধ্যে একটা শ্রেণি হচ্ছে চাকরি থেকে অবসরে যাওয়া ব্যক্তিবর্গ। এর একটা অংশ সুশিক্ষিত যারা সরকারি, বেসরকারি, বিভিন্ন সংস্থা, সামরিক বাহিনীতে কর্মকর্তা পদে সততার সাথে দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। এদের অর্জিত জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা থেকে সমাজ সেবা পেতে আশা করে। দেশের আনাচে-কানাচে এরা ছড়িয়ে আছেন। এদের অনেকে জীবনের পড়ন্ত বিকেলে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে সমাজকে কিছু দিয়ে যেতে চান। সমাজে এরা শ্রদ্ধেয়। সমাজ এদেরকে চায়। শিক্ষিত সমাজ গড়ে তুলতে এদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। এদেরকে খুঁজে খুঁজে সমাজ উন্নয়নের কাজে ভেড়ানো দরকার। একটা নীতিমালা হাতে তুলে দেওয়া দরকার।

সমাজের পরতে-পরতে আরেকটা পক্ষও মিশে আছে, যাদের শিক্ষা আছে, জ্ঞান আছে। ভালো-মন্দ বোঝার ক্ষমতা আছে। সমাজ এদের কথা এখনো নেয়। এদের একটা অংশ রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করে আত্মমর্যাদা ভুলে বিপথে গেছেন। বাকিরা তো ঠিক পথে আছেন। সমাজে এরা শিক্ষক হিসেবে পরিচিত। এরা ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার পাশাপাশি সমাজ-শিক্ষার দায়িত্ব নিতে পারেন। এরা জ্ঞান-গরিমা, শিক্ষা, চিন্তা-চেতনা, নতুন নতুন ভাব-ধারণা (আইডিয়া), দিক-নির্দেশনা দিয়ে জাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারেন, সমাজের

মানুষকে সুশিক্ষা দিতে পারেন। আমার বিশ্বাস, সুষ্ঠু পরিবেশ ও সমাজগঠনে অনুকূল পরিবেশ পেলেই এরা এগিয়ে আসবেন।

সামাজিক সুশিক্ষা ও সুস্থ সমাজগঠনকে যদি আমরা একটা সামাজিক আন্দোলন হিসেবে গ্রহণ করি, বিভিন্ন সমাজ-সংগঠনকে যদি এ-লক্ষ্যে ব্যবহার করি– এদেশে সামাজিক সুশিক্ষার অভাব হওয়ার কথা নয়। উল্লিখিত সামাজিক এসব পক্ষকে একত্র করে একটা অরাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে পারলে, সামাজিক এ স্বেচ্ছাসেবী সমাজসংগঠন চেষ্টা করলে, রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা পেলে অনেক অল্প সময়ে এদেশে সুশিক্ষা ও সুষ্ঠু সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব।

সর্বোপরি সরকার ইচ্ছে করলে পুরো দেশের মানবসম্পদের বাঞ্ছিত উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে 'মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়' গঠন করতে পারে। পরিকল্পিতভাবে সমাজউন্নয়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়ন করতে পারে। এটা সময়ের দাবি। তবে নামের আগে 'সরকারি' শব্দটা যোগ থাকাতে এর কার্যকারিতা ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে যত সন্দেহ ও ভয়। এ ভয়ও কর্মপদ্ধতি পরিবর্তন করে দূর করা সম্ভব।

(২৪ নভেম্বর ২০২২, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক।